বাংলায় ইসলাম
ও
মুসলিম সভ্যতা

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

॥ সূচিপত্র ॥

ভূমিকা	॥ ৯
বাংলার পরিচিতি : জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক অবস্থান	॥ ২৭
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন : প্রচলিত মিথ ও মিথ্যা	॥ ৩৬
বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার : রাজশক্তির ভূমিকা	॥ ৪৩
বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ামক শক্তি	॥ ৭০
বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ	॥ ১১০
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি	॥ ১৩৪
নগর, দরবার, গার্হস্থ্য ও বিনোদন	॥ ১৪২
মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা	॥ ১৬৮
নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা	॥ ১৭৫
মুসলিম বাংলায় শিল্পের বিকাশ	॥ ১৭৮
বাংলার অতুলনীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি	॥ ১৮৮
বাংলার মুদ্রা ও প্রশাসন	॥ ২০৪
বাংলার চারুকলা ও লিখনকলা	॥ ২১২
গ্রন্থপঞ্জি	॥ ২১৮

ভূমিকা

০১

পৃথিবীর ইতিহাসে 'বাংলা' নামক ভূখণ্ডটি বর্তমানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃত এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্ম-পরিচয়ে মুসলিম। বর্তমানের মুসলিম দেশসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশ লাগালাগি অবস্থান করছে। কিন্তু বাংলা এমনটি নয়। কীভাবে এবং কেনই-বা এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম, তা জানার জন্য অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রায় দেড় শ বছর ধরে বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলছে নানা বিতর্ক। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান বলেন—

> চিরাচরিত প্রজ্ঞামতে ইতিহাস কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয় না; ইতিহাস নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই এবং যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোও নিশ্চিত নয়। তথ্যের অভাবে বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে সকল আলোচনাই অনুমান অথবা তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী—আশরাফ শ্রেণির মুসলমানদের বসতি স্থাপন, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ, বৌদ্ধদের ইসলামে দীক্ষা এবং সুফি দরবেশদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে, ঐতিহাসিকগণ এই পাঁচটির যেকোনো একটিকে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে মতবাদটি জনপ্রিয় হয়েছে তা হলো—বাংলাদেশে সুফি, দরবেশ ও পীরগণ ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। ড. আকবর আলী খান বলেন—

> এই তত্ত্বের দুর্বলতা হলো মুসলমান সুফি, দরবেশ ও পীরগণ ইসলামের বাণী নিয়ে শুধু বাংলা প্রদেশেই আসেননি, ভারতের সর্বত্র তারা গিয়েছেন। এই পীরেরা কেন শুধু বাংলায় সফল হয়েছেন, অথচ ভারতের সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছেন, তারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এ সময়ে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছে, তার সকল বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ বলেন—

> বাংলাই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের গতি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসরণ করেনি। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বহু পূর্বেই বাংলায় মুসলিম বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এ অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি আছে। এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে ইসলামি সংস্কৃতির মূল ভাব, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও যুক্তিবাদিতার প্রসারই হয়েছিল বেশি।

ড. আবদুল করিম বলেন—

> মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে সুফি দরবেশ এসেছিলেন কিনা ইতিহাস তা বলতেও পারে না। তবুও পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি ও সোলেমান, সুরদাদবেহ, আল ইদ্রিসী, আল-মাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদুদল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়।

মূলত তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির বিজয়ের পরই ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস পায়। আর জনসাধারণের মাঝে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধর্মবেত্তাগণ। এ কাজে তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ কথা স্বীকার্য যে, রাজশক্তি ভিন্ন বিশ্বে কোথাও ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তা-ই নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অভাব হেতু অনেক জায়গায় মুসলমানগণ পুরোপুরিভাবে উৎখাত হয়ে গেছেন সুদীর্ঘকালের ইসলামি খিলাফতের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও। স্পেন আমাদের সামনে তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিনির্মাণে রাজশক্তিই সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে; বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে পীর-মাশায়েখ-আউলিয়াদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর ভেতরে সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষক শ্রেণি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা নিয়ে আধুনিক সময় পর্যন্ত তেমন মাতামাতি আছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—বাংলায় এত মুসলমান কোথা থেকে এলো? বেভারলি বলেন—'বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্যের কারণ হলো, বিপুলসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে।' ড. আকবর আলী খান বলেন—

> ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। খোন্দকার ফজলে রাব্বি, ডক্টর আবদুর রহিম ও ডক্টর মোহর আলি মনে করেন যে, বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর; ধর্মান্তরিত হিন্দুরা মুসলমান জনসংখ্যার বড় বংশ নয়।

বাংলাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক নৃতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেন হার্বার্ট রিজলি নামক একজন সিভিলিয়ান। এই জরিপের ফলাফল ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। রিজলির মতে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের (যেমন : পাদ, কোচ ও চণ্ডাল) লোকজনের মিল বেশি। ফলে রিজলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বেভারলি ও রিজলির বক্তব্য সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি। তিনি বলেন—বাংলার মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়নি; তাদের অধিকাংশই পশ্চিম এশিয়া হতে আগত অভিবাসী আশরাফ মুসলমানের সন্তান। তিনি বলেন, রিজলির জরিপ ২৮৫ জন বাঙালি গরিব মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এরা ছিল জেলের কয়েদি। দ্বিতীয়ত, রিজলি হিন্দুদের ১৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করে জরিপকার্য সমাধা করলেও সব মুসলমানকে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন। তৃতীয়ত, রাব্বি দাবি করেন—দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বাস করার ফলে মুসলমান অভিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও মুসলমান অভিবাসী আর হিন্দু জনগোষ্ঠীর

মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চেহারায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি আরও দাবি করেন, ভারতের ৫৬২ বছরের অবিচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনামলে এমন কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলায় দলে দলে মানুষ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, আরব ও ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমানদের বাংলায় অভিবাসনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এজন্য বাঙালি মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা ও উচ্চারণ বাঙালি হিন্দু থেকে ভিন্ন। ড. আকবর আলী খান বলেন—

> রিজলির পরিমাণ ভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুর্বলতাগুলো রাব্বি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলার বেশির ভাগ মুসলমানই যে অভিবাসীদের সন্তান, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকার কারণে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ধর্মান্তকরণ আদৌ ঘটেনি। কিন্তু বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের অনুমানকে সমর্থন করে।

রিজলি সাহেবের কাজের সময় তাঁকে সহায়তা করেছিলেন বাবু কুমুদ বিহারী। ড. রাব্বি বলেন—'আমি তাঁর নিকট জানতে পারি যে, তিনি (রিজলি) ইচ্ছা করেই উচ্চ বংশজাত, সম্মানযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের মাপজোখ গ্রহণ করেননি; কেবল নিম্নতম শ্রেণির মুসলমানদের মাপজোখই গ্রহণ করেছেন।' তিনি আরও লেখেন—

> রিজলি সাহেবের মতানুযায়ী দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর নাক ও মোটামুটি সুশ্রী মুখমণ্ডল যদি একটি উৎকৃষ্টতর জাতির লক্ষ্মণ হয়ে থাকে, তাহলে একই শ্রেণির হিন্দুদের চাইতে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যেই সেগুলোর সাক্ষাৎ অধিক পরিমাণে মিলবে। এ দুটি জাতির কেবল নাকের পরীক্ষা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হবে যে, এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলার আদিম জাতি ও উপজাতির বংশধর নয়।...
>
> বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ পরিবারই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে যে, ঐ সমস্ত পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত তাদের কুল এবং পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বিবরণের কথা খুব সামান্যই জানে। অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য তাদের এত বেশি নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে, তারা এখন জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আকবর আলী খান বলেন—

> যদিও অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নরগোষ্ঠীর শ্রেণি বিচারে সমরূপ; তবুও বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান অভিবাসী যে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে অবিসংবাদিত প্রমাণ রয়েছে। বাংলার কিছু মুসলমানের জন্ম হয়েছে স্থানীয় ও অভিবাসী মানুষের সংমিশ্রণে।...
>
> বিতর্কের মূল বিষয় তাই দাঁড়িয়েছে, বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার কত অংশ অভিবাসী, তা নির্ধারণ করা। ১৯০১ সালে ই. এ. গেইট বাংলার আদমশুমারি পরিচালনা করার সময়ে মুসলমানদের শতকরা কত অভিবাসীদের বংশধর, তার একটি হিসাব করার চেষ্টা করেন। তার মতে সেই সংখ্যাটা ১৬.৬ শতাংশের অধিক হওয়া সম্ভব নয়।

গেইটের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ১৯০১ সালে এ. এ. গজনভি অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন—'আমার ধারণা, মোটামুটিভাবে এখনকার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান বিদেশি অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ বংশধর, শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।' ড. মোহর আলিও গেইটের উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর অভিমত হচ্ছে—'বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।' তিনি আরও বলেন—'সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক ও বাংলার মুসলমানদের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।' ঐতিহাসিক ড. অতুল সুর বলেন—

> বাংলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—আগন্তুক মুসলমান, ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং সংমিশ্রিত মুসলমান। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাংলার মুসলমান শাসক ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশি মুসলমানদের বংশধর। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণির মুসলমান হচ্ছে উপরিউক্ত দুই শ্রেণির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তার মতে এই সকল মুসলমানদের উদ্ভব ঘটেছিল সাড়ে ৫০০ বছরের মধ্যে (১২০৩-১৭৬৫)। এরপরের মুসলমানদের তিনি দেশজ মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।...
>
> জোর জুলুম করেই যে মুসলমান করা হতো, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হতো। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকা দ্বারা আকৃষ্ট হত। খানকাগুলো ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুই-ই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীর ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়ে বেচে দিত। মুসলমানরা তাদের কিনত এবং তাদের ধর্মান্তরিত করত। উচ্চশ্রেণির বর্ণ হিন্দুরা কমই ধর্মান্তরিত হতো। মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোনো জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, তাহলে তাঁকে সপরিবার মুসলমান করা হতো।...এক কথায়, বাঙালি মুসলমান বাঙালি; তারা আগন্তুক নয়।

ড. এবনে গোলাম সামাদ বলেন—

> পালদের পরে আসেন সেন রাজারা (১০৯৫-১২০০ খ্রি.)। সেন রাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং তারা বাংলার লোক ছিলেন না। এরাই বাংলায় বর্ণাশ্রম (Caste System) চালু করে এবং এদের অত্যাচারে বৌদ্ধরাই সম্ভবত দলে দলে গ্রহণ করে ইসলাম। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা ভারতের শতকরা ৩৬ ভাগ মুসলমানের বাস বাংলায়। প্রধানত বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতেই তাদের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কখনোই পুরোপুরি হিন্দু ছিল না। এই অঞ্চলে মুসলমান আগমনের আগে প্রচলিত ছিল এক ধরনের বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা

মনে করত অশুচি। এই অপমানিত বৌদ্ধরাই পাঠান আমলে বিশেষভাবে সাড়া দেয় ইসলামের ডাকে।

ড. এবনে গোলাম সামাদ মনে করেন, বাংলায় যেসব মুসলমান আসেন তাদের মধ্যে মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা (পাঠান) অধিকসংখ্যক এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের লোক বেশি। তিনি বলেন—

> মুসলমান নৃপতিরা জোর করে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল, এই মতে আর স্থির থাকা যাচ্ছে না। কেননা, ১৮৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে। মুসলমান নৃপতিদের আমলে নয়, ইংরেজ শাসনামলে এ দেশে ঘটেছে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি। আর ইংরেজ আমলে জোর করে হিন্দুকে মুসলমান করার সুযোগ ছিল না। তাই বলা চলে না, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হিন্দুদের বল প্রয়োগ করে মুসলমান করা।...
>
> বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব এসেছে দুটি ভিন্ন দিক থেকে। স্থলপথে মধ্য এশিয়া থেকে এসেছে তুর্কিরা; আফগানিস্তান হয়ে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আরব মুসলমান বণিকরা এসেছেন দক্ষিণের সমুদ্র পথ ধরে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এখন তুর্কিদেরই মতো হানাফি মাজহাবভুক্ত। ইসলামি আইনের যে ব্যাখ্যা তারা মানেন, তা ইমাম আবু হানাফি (রহ.) প্রদত্ত। কিন্তু দক্ষিণ আরবের লোক শাফেয়ি মাজহাবভুক্ত এবং ইন্দোনেশিয়াতেও শাফেয়ি ফিকাহ প্রচলিত। কেননা, ইন্দোনেশিয়াতে আরব বণিকরাই ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, বাইরে থেকে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি করেছিলেন। অন্যদিকে বহু স্থানীয় বাসিন্দাও গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম। এ দুয়ে মিলেই গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশের মুসলিম জনসমাজ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের একটি বড় কারণ হলো বাইরে থেকে এই অঞ্চলে অনেক মুসলমানের আগমন ও বসতি স্থাপন। বাংলার উর্বর ভূমি ও বাণিজ্য সম্পদ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। আর বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে প্রধানত তাদের অধিক প্রজনন (Superior Fertility) হারের কারণে। কেবল বাংলাদেশে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের জন্মহার অধিক। মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ এবং উন্নতমানের আমিষ খাদ্য গ্রহণ এই উচ্চ জন্মহারের সহায়ক।[১]

বাংলাদেশ রাজশক্তি কর্তৃক বিজিত হয়েছে; ফলে এখানে দ্রুত অভিবাসন ঘটেছে। আলিম-উলামা, সুফি এবং প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর এভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরও বাংলা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত হতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বাস করা হতো, বাংলা প্রদেশও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একটি হিন্দু

---

[১] এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (রাজশাহী : পরিলেখ, ২০১৯) পৃ. ২৯-৩১

প্রদেশ। ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আদমশুমারিতেই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, বাংলায় প্রায় ৫০ শতাংশ লোক মুসলমান। ১৮৭০ সালের বাংলা প্রদেশে মুসলমান ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ, কিন্তু ১৯০১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ১৫ লাখে। এই যে ত্রিশ বছরে প্রায় ৪০ লাখ মুসলমান বৃদ্ধি পেল; এতে কিন্তু কোনো অভিবাসন, ধর্মান্তর, জোরজবরদস্তি কিংবা পীর-সুফিদের কেরামতি প্রয়োজন পড়েনি। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বপ্রথম বাংলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা, গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায়। এতে প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যায় সামান্য তারতম্য ছিল। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় সেন্সাস রিপোর্টে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ জনসমষ্টির মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বেশি হয়। মোটকথা শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে মিশ্র রক্ত ধারার মানুষ—এ বিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন এবং বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও মুসলমান সমাজের পত্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০২

সুন্দরচিত্ত মানুষের প্রভাবেই সভ্যতা সৃষ্টি হয়। পরস্পরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, স্রষ্টা ও পরকালে বিশ্বাস, নারীর প্রতি সম্মান ও সমদর্শিতা সভ্যতার অনিবার্য গুণ বলে অনেকের বিশ্বাস। কেউ কেউ মনে করেন, সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সভ্যতার বিশেষ লক্ষ্য নয়। রোমকদের চেয়ে রোম বিজয়ী বর্বরদের সভ্য বলা বাতুলতা, আর মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতিবিধ্বংসী তাতার জাতি যে জানোয়ারের বাড়া ছিল না, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত।[২]

প্রাচীনপন্থি ঐতিহাসিকদের মতে, বিভিন্ন সময়ে মাত্র চারটি দেশ সুসভ্য হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০ অব্দের আথেনীয় সভ্যতা, রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সভ্যতা, রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় সভ্যতা আর সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফরাসি সভ্যতা। আধুনিকরাও এই মতে সমর্থন করেন, তবে রোমকে সুসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করতে তারা নারাজ। অনেকের মতে, কোনো যুগেই রোম বর্বরতার সীমা অতিক্রম করে সুসভ্য হতে পারেনি। রোমে আলোক ও মাধুর্যের সাধনা গভীরভাবে হয়নি। প্রগাঢ় প্রেম, সুগভীর সৌন্দর্যাবেগ ও সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা রোমকদের ছিল না বললেই চলে। রুচির ব্যাপারে তারা তেমন উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে পারেনি। আইনের ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ তারা দেখিয়েছে, তাও গ্রিক প্রভাবের ফল। তবে গ্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈততা নেই। অনেকের মতে, মলোল থেকে অ্যারিস্টটল ও আলেকজান্ডার পর্যন্ত (৫৮০-৩২৩) যে সুদীর্ঘকাল, তা ছিল সভ্যতার ঐশ্বর্য যুগ। বোকাচিওর মৃত্যু থেকে রোমের লুণ্ঠন অবধি ইতালীয়রা এমন এক উঁচু সভ্যতা সৃষ্টি করে, যার সম্বন্ধে কোনো প্রকার মতদ্বৈততা নেই।[৩] আর ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ—এই সময়ব্যাপী ফরাসি জাতি যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল,

---

[২] মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সভ্যতা* (ক্লাইভ বেল অবলম্বনে), (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ৯-১৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

তা পেরিক্লিসীয় সভ্যতার[৪] মতোই বিখ্যাত ছিল। সুসভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন হলো সপ্ত-অষ্টাদশ শতকের এই ফরাসি সভ্যতা।[৫]

সকল ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতো লন্ডনের ব্লুমসবারি গ্রুপের (১৯০৭-১৯৩০) অন্যতম চিন্তক ক্লাইভ বেলও মুসলমানদের সভ্যতাকে এড়িয়ে গেছেন, এড়িয়ে গেছেন চৈনিক সভ্যতাকেও। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন—

> সুরুচি ও মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী হলেও কোনো সুস্পষ্ট চেহারা নেই বলে তাকে (টাংসাং যুগীয় চৈনিক সভ্যতা) আমাদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। হাফিজ, উমর, বুলবুল, সাকির পারস্যকেও একই কারণে বাদ দেওয়া গেল। পারস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত স্বল্প যে, অনেক সময় পারস্য সভ্যতাকে খেলাফতের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়। আর শাহদের মোগল সম্রাট বলে ভুল করা হয়। বিরাট মুসলিম সভ্যতার ধারণা এই ভুলের গোড়ায়। মুসলিম সভ্যতা বিশেষ দেশে ও কালে পুষ্পিত হয়ে ওঠে; অসীম কাল ও স্থানে ছড়িয়ে পড়ে না। এ ধারণার অভাব হলে সুসভ্যতা নিরূপণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন মুসলিম দেশকে একত্রে সাধারণভাবে মুসলিম সভ্যতা বলা যায়; কিন্তু বিশেষভাবে যখন কোনো দেশ কোনো সময়ে সভ্যতার আরাধনা করে, তখন তাকে সাধারণ নামে অভিহিত না করে বিশেষ নামে অভিহিত করা ভালো। দেশের নামানুযায়ী বা যুগের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তার নামকরণ করা উচিত।[৬]

ক্লাইভ বেলের মতে—'রাষ্ট্র আর সভ্যতা এক জিনিস নয়। রাষ্ট্র সভ্যতা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না।' তিনি আরও বলেন—

> রাষ্ট্রের কাজ নিরাপত্তা ও অবসর সৃষ্টি করা; কিন্তু সেই নিরাপত্তা ও অবসর নিয়ে মানুষ কী করবে তা নির্ধারণের ভার রাষ্ট্রের ওপর নয়, মানুষের ওপর।... অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহ যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে এবং তাদের উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সত্যতার সৃষ্টি হয়। তাই সভ্যতার জন্য প্রতিভার চেয়ে সমঝদারির প্রয়োজনীয়তা বেশি। কেননা, সমঝদারির ফলেই আলোক ও মাধুর্যের বিকিরণ সম্ভব হয়। আর তাদের বিকিরণই সত্যতা।[৭]

অনেকে সভ্যতা বলতে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানকে বুঝিয়ে থাকেন। যোগাযোগব্যবস্থা, স্থাপত্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকারখানা, উৎপাদন যন্ত্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সভ্যতার নিদর্শন হতে পারে। তবে সংস্কৃতি অবস্তুগত হলেও সভ্যতা সূর্যের আলোর মতোই স্পষ্ট। এটাকে কোনো দেশের গণ্ডির মধ্যে রাখা যায় না, এটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

সভ্যতার বড়ো বিশেষত্ব হচ্ছে শহর। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহ সিন্ধু, গঙ্গা, নীলনদ, হোয়াংহো, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। উত্তর আফ্রিকার মিশর এবং পশ্চিম

---

[৪] পেরিক্লিস ছিলেন একজন অভিজাত বংশীয় গ্রিক জেনারেল। তার নেতৃত্বে এথেন্সের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। ইতিহাসে তার যুগকেই 'পেরিক্লিস যুগ' বলা হয়।

[৫] মোতাহের হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

এশিয়ার সুমের—উভয় স্থানেই প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল ছিল। তাই এসব জায়গায় শহর গড়ে ওঠে। উভয় স্থানেই স্বাভাবিক সেচের সুবিধা ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সময়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল মাটির তৈরি পাত্র। পরবর্তী সময়ে পাথরের কারুকার্যেও মানুষ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। তামা গলিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তারা ব্যবহার করতে শেখে। তামার সঙ্গে টিন ও সিসা মিশিয়ে আবিষ্কার করে ব্রোঞ্জ। মিশরের রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে মাটির পাত্রে পালতোলা নৌকার চিত্র এবং সিরিয়া, সুমেরে ষাঁড় দিয়ে টানা চার চাকার গাড়ি প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলনস্থল পরিচিত ছিল সেন্নার নামে। সেন্নারের সমুদ্র অঞ্চলে সুমেররা এবং উত্তর দিকে আক্কাডিয়ানরা বাস করত। সুমের ও আক্কাডিয়ানরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্তিকা স্তূপের ওপর শহর, গ্রাম ও মন্দির নির্মাণ করেছিল। এরা উন্নত বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটা এবং যন্ত্রের সাহায্যে সেচ দেওয়া জানত। এখানে কয়েক শ জমিদারি ছিল। উৎকৃষ্ট জমিগুলো জমিদাররা নিজেদের দখলে রাখত। কৃষকদের উচ্চহারে খাজনা প্রদান করতে হতো এবং জমিদারদের জমিতে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হতো। প্রাসাদ ও মন্দিরের চারিদিকে ছিল কারিগরদের বসতি। সময়ের পরিক্রমায় অনেক জমিদারের ওপর বিজয়ী জমিদার 'ইসাক' বা রাজা হয়ে বসে। এসব ইসাকরা নিজেদের ঈশ্বরের বংশধর বলে দাবি করত। একসময় সকলের চেয়ে প্রতিপত্তিশালী সামন্তপ্রভু হয়ে বসেন আক্কাডার রাজা সারুকেনু। সেন্নারের সকল সামন্ত তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তিনি সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করেন এবং সুমের ও আক্কাডিয়ানদের যুক্তরাজ্য সেন্নার গড়ে তুলেন ২৬৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা হাম্বুরাবি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৫০ সালে সুমেরদের পরাজিত করে ব্যাবিলন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সুমের ও আক্কাডিয়ানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুছে যায় এবং সেন্নারের নাম হয় ব্যাবিলন। ধীরে ধীরে ব্যাবিলন সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তী টাইগ্রিসের উপরিভাগ ইরান সীমান্তে বসবাসকারী এসিরীয় জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-৬৬৮ সালের মধ্যে এসিরীয় বাহিনী সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও আর্মেনীয়া জয় করে। ব্যাবিলন স্বেচ্ছায় সিরিয়ানদের বশ্যতা স্বীকার করে। একপর্যায়ে এসিরীয় রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটলে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ অব্দে ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পারসিয়ান রাজা কাইরুস খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৭ সনে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর জয় করলে মাত্র ৯০ বছরের ক্যালডিয়ান রাজত্বের অবসান ঘটে। ক্যালডিয়ান ও পারসিক সামন্তপ্রভুদের আমলে বিজিত দেশের লোকদের নির্মমভাবে শোষণ করা হতো। পারসিক রাজারা পুরোহিতদের খুশি করার চেষ্টা করত। ফলে পুরোহিতরা ঘোষণা করেছিল, রাজা কাইরুস ও তার উত্তরাধিকারীরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ক্যালডিয়ান ও পারসিয়ানদের রাজত্বকালে ব্যাবিলন সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্যালডিয়ান রাজা নেবুচাঁদ নেজারের সময় ব্যাবিলনে মন্দির, অট্টালিকা ও প্রমোদকুঞ্জ তৈরি হয় এবং কয়েকটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানেরও আবির্ভাব ঘটে। ব্যাংকারদের তত্ত্বাবধানের বহু শিল্প গড়ে ওঠে।[৮] পারসিয়ানদের পতন পর্যন্ত ব্যাবিলন অর্থনৈতিক, ব্যাবসায়িক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সনে গ্রিকরা ব্যাবিলন দখল করে।

---

[৮] রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৪১

সেন্নারের মতো মিশরেও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। তারাও বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, বাড়িঘর, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করেছিল। খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর ৩০ থেকে ৪০টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০০ অব্দে সারা মিশর একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মিশরের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সকলের ওপরে ছিল রাজা, তারপর সামন্ত জমিদার ও মন্দিরের পুরোহিত। এখানে প্রায় সাতাশটি রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল।[৯] পরবর্তী সময়ে ফারাও (রাজা) শাসিত মিশর বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে হোয়াংহো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা। খ্রিষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগেই এখানে সামন্ত নৃপতিরা রাজত্ব করত। তবে চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ১১২২ সাল থেকে। তখন এই সামন্ত রাষ্ট্রের শাসক ছিল চৌ রাজবংশ। এ সময় চীনে একশ বড়ো সামন্ত এবং পনেরো শ ছোটো সামন্ত ছিল। সিল্কের পোশাক, রাস্তাঘাট, বাঁধ ও প্রাসাদ নির্মাণে এরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। তেমনিভাবে সিন্ধু সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা ও রোমান সভ্যতা বিশ্বের বুকে নিজেদের অমর কীর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

নীলনদের উপত্যকা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের তীরভূমি এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারই নবীন উত্তরাধিকারী মুসলমানরা। আটলান্টিক সাগরের বিস্তীর্ণ বালুতট থেকে চীনের নিবিড়তম অঞ্চল পর্যন্ত এই নবীন বিশ্বজয়ীরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আয়তনে এই সাম্রাজ্য ছিল সুবর্ণ যুগের রোম সাম্রাজ্যের চেয়েও বিশাল। ত্বরিত ও ব্যাপক এই বিস্তার ইতিহাসে নজিরবিহীন। বর্ণ, ভাষা ও আকৃতিতে ভিন্ন যে অজস্র জনগোষ্ঠী আরবীয় রাজদণ্ডের আওতায় আসে; তার তুলনায় হেলেনীয়, রোমান, অ্যাংলো-স্যাকসন বা রাশিয়ান সাম্রাজ্যও তুচ্ছ। আরবীয়রা শুধু এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়ে তোলেনি, সৃষ্টি করেছিল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির। গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির ধারায় পরিপুষ্ট আরবীয়রা এই সংস্কৃতির নির্যাস পৌঁছে দিয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপের বিদগ্ধজনের কাছে। আবরীয় এবং আরবিভাষীদের অগ্রণী ভূমিকাতেই মধ্যযুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্যাবিলনীয়, ক্যালডীয়, হিট্টাইট এবং ফিনিশীয়রা আজ বিলুপ্ত, কিন্তু আরবীয় এবং আরবিভাষীদের অস্তিত্ব আজও প্রখরভাবে বিদ্যমান।[১০] মক্কায় মহানবি (সা.)-এর উত্থান থেকে আব্বাসীয়দের পতন (১২৫৮ খ্রি.) এবং পরবর্তী সময়ে উসমানীয়দের উত্থান—পুরো মধ্যযুগজুড়ে মুসলিম ভূখণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা-ই মূলত মুসলিম সভ্যতা হিসেবে পরিচিত। পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের নির্যাস থেকে সমৃদ্ধ হলেও এ সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্য স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সভ্যতার শিল্পকলা, চিত্রকলা, লিপিকলা ও স্থাপত্য অবশ্যই স্বতন্ত্র এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। মুসলিম সভ্যতা বিকাশের একেবারে শেষের দিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। মুসলিম চিন্তাধারার ধারক ও বাহকেরা এখানেও ইসলামি সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয়—মধ্য এশিয়া থেকে যেসব তুর্কি বা তুরানি মুসলমান এই উপমহাদেশে এসে রাজ বিস্তার করেছিলেন, তাদের কোনো উন্নত সংস্কৃতি বা সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল না; তারা কেবলই ছিলেন রণনিপুণ যোদ্ধামাত্র। কিন্তু এ ধারণা মোটেও সত্য নয়। তারা এই উপমহাদেশে মধ্য এশিয়া থেকে

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১০] ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১-২; অনু. জয়ন্ত সিংহ ও অন্যান্য।

বহন করে এনেছিলেন একটা উন্নত সভ্যতার ঐতিহ্যকে।[১১] মুসলমান শাসকদের সঙ্গে বঙ্গদেশে কেবল ইসলাম ধর্ম আসেনি, একটা বিশাল অঞ্চলের বিচিত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতাও এসেছিল।[১২]

বাংলায় আগমনকারী মুসলমানগণ মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন। এসব অঞ্চল বাংলা বিজয়ের পরপরই ইসলামি সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। যদি স্থাপত্যের কথাই ধরি, তাহলে দেখব—বাংলা বিজয়ী মুসলিমগণ মধ্য এশিয়া থেকে একটি পূর্ণ মুসলিম স্থাপত্যের ধারণা নিয়েই বাংলায় এসেছিলেন। তারা তাদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন স্থানীয় ভাবধারার। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুনত্বের। মুসলমানগণই এ দেশে খিলান, গম্বুজ ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। পাথরের স্বল্পতা হেতু নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ব্যবহার করলেও তারা ইমারতের বহিঃগাত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তরটালি (Slab) ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যমান নিদর্শনাবলি থেকে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকার এক কক্ষবিশিষ্ট এবং ছাদ উঁচু শিখরে আবৃত। মুসলিম শাসনামলে নির্মিত স্থাপনাগুলো বিস্তৃত এবং দোচালা ও চৌচালা ছাদবিশিষ্ট। বাংলার বাঁশ-খড়ে নির্মিত জীর্ণ কুটিরের বক্রাকার চালা মুসলিম শাসনামলে ইট নির্মিত হয়ে দেখা দেয়। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে মুসলমানগণ তাদের স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন। অলংকরণের বিষয়বস্তুতে জীবন্ত প্রতীক ও ভাস্কর্যের স্থলে তারা বিমূর্ত প্রতীক, প্যাঁচানো লতাপাতা, লিপিকলা, গোলাপ নকশা ও জ্যামিতিক নকশার প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাণ উপকরণ, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ কাঠামো ও অলংকার বাংলার মন্দির স্থাপত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

আরব সভ্যতা (ইসলামি সভ্যতা) বলতে আমরা যা বুঝি, তা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদৌ আরবীয় নয়। এর মধ্যে আরবের যেটুকু অবদান ছিল, তা ভাষাগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। খলিফাদের আমলে সিরীয়, পারসি, মিশরি, মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত বা খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা ছিল সমাজে আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রতীকস্বরূপ। আরব ইসলামি সভ্যতা তৃণমূলে গ্রিক, সিরীয় ও ইরানি সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। বিরাট অর্থে, যে সাবেক সেমেটিক সভ্যতা এসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, আরামীয়, ফিনিশীয় ও হিব্রু ধারার মারফত বিকশিত হয়; তারই যুক্তিযুক্ত পরিণতি ছিল আরব ইসলামি সভ্যতা। এই সভ্যতার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ঐক্য পরিণতি লাভ করে।[১৩]

সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্প এক ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এই স্থাপত্য দিল্লির সুলতানি অথবা পশ্চিম এশিয়ার সামসময়িক স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এই শিল্প পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য থেকে বহুলাংশে নীত, তবুও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলার স্বকীয় শিল্পরূপ এবং পদ্ধতি এই নতুন ধারায় বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[১৪] পূর্ববর্তী রোমান স্থাপত্য শিল্প ব্যতীত যেমন গথিক স্থাপত্য অথবা প্রাচীন গ্রেকো-রোমান, সিরীয়, বাইজান্টাইন ও সাসানীয় কলা ছাড়া যেমন প্রাথমিক মুসলিম

---

[১১] এবনে গোলাম সামাদ, *আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (রাজশাহী : পরিলেখ, ২০১৯), পৃ. ৩২

[১২] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর, ২০১২), পৃ. ২৯

[১৩] ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, অনু. জয়ন্ত ও অন্যান্য (কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৩

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

স্থাপত্যের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনিই বাংলাদেশেও মোগল নির্মাণ শিল্পের গঠন ও বিকাশ পূর্ববর্তী সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব ছাড়া কল্পনা করা যায় না। মসজিদ ও সমাধি, মিনার ও ঈদগাহ, দুর্গ ও কাটরা, রাজপ্রাসাদ ও হাম্মামখানা, কদম রসূল ও ইমামবাড়া ইত্যাদি পূর্ববর্তী দুটি প্রাচীন রীতির ফসল—একটি সুলতানি স্থাপত্য ধারা এবং আরেকটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম শৈলী।

স্থাপত্য যদি মুসলিম শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে মুসলিম স্থাপত্যের প্রাণরূপী প্রধান অঙ্গ মসজিদই সর্বতোভাবে এর চূড়ান্ত অর্জনের প্রতীক। সর্বযুগে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তুলনামূলকভাবে মসজিদই অধিক পরিমাণে নির্মিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের শাসক, সরকারি আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, অমাত্য ও আর্থিকভাবে সচ্ছল সাধারণ নাগরিকবৃন্দ—সকলেই মসজিদ নির্মাণে ব্রতী ছিলেন। ফলে মুসলিম স্থাপত্যের অন্য কোনো ইমারত শুধু সংখ্যা বিচারেই নয়, জাঁকালো অবকাঠামো ও দীপ্তিমান অলংকরণ—কোনো বিশেষত্বেই মসজিদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

ইতিহাসচর্চার আলোকিত সময়ে মুসলমানগণ বাংলা অধিকার করে। দিল্লিতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মুসলিম ইতিহাসচর্চা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেন, যে ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়; বরঞ্চ একটি মিশ্রিত ধারার জন্ম দিয়েছে। তখন থেকে এই মিশ্রিত ধারাই বাংলার ইতিহাসের একটি উৎকৃষ্টতম দিক হিসেবে বিবেচিত।[১৫] সম্পূর্ণ পৃথক ধ্যানধারণা নিয়ে আসা মুসলিম শাসকদের সাথে প্রাথমিকভাবে দেশীয় সংস্কৃতির একটা সংঘাতও উপস্থিত হয়। তবে বৌদ্ধ চিন্তাচেতনা ও হিন্দু আধ্যাত্মবাদের সাথে মিলিত হয়ে তারা থেকে যায় এ দেশের সংস্কৃতিতে। কালক্রমে বিজিত ও বিজেতা একটি ভারসাম্যে আসতে সমর্থ হয়। তবে বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রাথমিক যুগের শিল্প-নিদর্শন অপ্রতুল।

মুসলমানদের আগমন এ দেশের সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় যে ব্যাপক, গভীর ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে, তার খুব সামান্যই আমরা জানি। উপরন্তু এত কম এবং ভুল জানি যে—বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় তা যে মুসলমানদেরই দান, সে কথা শুনলেই অনেকে চমকে ওঠেন। এক ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখেছেন—'মুসলমানরাই এ দেশে পানি ও মাটি বিভাজনকারী।' অথচ তারা এ দেশে আসার পর এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী মানুষের মর্যাদা পেত না। মুসলমানরাই এ দেশে একটি সভ্যতা গড়ে তোলেন। বলা দরকার, ব্রিটিশ আমলে ২০০ বছর পরাধীন এবং বাংলাদেশ আমলে ৫২ বছর স্বাধীন থাকার পরও আমরা জানতে পারিনি আমাদের সঠিক অতীতকে। তাই আমরা মনে করি, চিরকাল ভারতীয় বাংলার লোকেরাই আমাদের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা সবকিছুর জোগান দিয়েছে। আসল কথাটা পুরোপুরি বিপরীত। ৫০০ বছর (১৩০১-১৮০০ খ্রি.) ধরে এবং বাঙ্গাল-এর বাঙালরাই গৌড়ীয়দের সভ্যতা, কৃষ্টি, সাহিত্য, উন্নত ধর্ম ও জীবনপ্রণালির জোগান দিয়ে এসেছে। কিন্তু সেসব ইতিহাস হারিয়ে গেছে, তা পুনরায় খুঁজে পাওয়ার পথও এতকাল আমরা পাইনি। সেজন্য মুসলমানরাই বাংলা ভাষার আদি ওয়ালেদ বা পিতা বললে আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ, এমন কথা প্রচলিত

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

কোনো ইতিহাসগ্রন্থে লেখা নেই। কেউ লেখেননি। কেউ বলেননি। তাই এ কথা আজ কবুল না করে উপায় নেই যে, ২০০ বছরের পরাধীনতা ও ৫২ বছরের স্বাধীনতা আমাদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির সত্যিকার কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই।[১৬] কেন এমন হলো? ড. এস.এম. লুৎফর রহমান বলেন—

> এর কারণ হলো গত ২০০ বছর (১৮০১-১৯৯৯) আমরা সর্বক্ষেত্রেই ভুল ও বিকৃত তথ্যের বা Wrong information-এর মধ্যে রয়েছি। আমাদের অসচেতন বা Uncritical পড়াশোনা, লেখালেখি, আলোচনা গবেষণা কেবল একটি নির্দিষ্ট লাইনে, কাটা খাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ খাতটি আমাদের বানানো নয়। ওর নির্মাতা ইঙ্গ-হিন্দু পণ্ডিতগণ; যারা হাড়ে হাড়ে ছিলেন মুসলিমবিদ্বেষী; ইতিহাসের শত্রু এবং সত্যেরও শত্রু।...এ দেশের সব রকম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই 'বিদ্বেষ' ও 'শত্রুতা' এত সূক্ষ্ম, এত বেমালুম এবং এত অভিভূতকারী যে—তার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। এরা ইতিহাসকে কেবল ঘুরিয়েই লেখেনি, ইতিহাস বিকৃত করেছে, বর্জন করেছে, গোপন করেছে, তথ্যহীন করেছে, প্রয়োজনে তথ্য নির্মাণও করেছে। তার একটা নজির দিয়ে বলা যায়, সুবিখ্যাত ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস এ লিখেছেন—'সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে।' এই বাক্যে যে মিথ্যা, ভুল বা বিকৃত তথ্য আছে তা হলো—নীহাররঞ্জন রায় ভালো করেই জানতেন যে, 'তথাকথিত পাঠান আমলে' সমগ্র বাংলাদেশ 'বঙ্গ' নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়নি; হয়েছে 'বাংলা' বা 'বাংলাহ' নাম নিয়ে। কিন্তু এই শব্দটা নীহাররঞ্জন রায়-এর নিকট 'পাপ-শব্দ' বলে তা বদলিয়ে লেখা হয়েছে। নাম-শব্দের এই পরিবর্তন কি সঠিক ইতিহাসেরও পরিবর্তন নয়? দ্বিতীয়ত, রায় মশাই ঐ বাক্যে 'হিন্দু আমল'-এর বিপরীতে বসিয়েছেন 'তথাকথিত পাঠান আমলে'। তিনি যদি 'হিন্দু আমলে ঘটে নাই। তাহা ঘটিল মুসলিম আমলে' লিখতেন, তাহলে কি অন্যায় হতো? বরং সেটাই ঠিক হতো জেনেও নীহাররঞ্জন রায় 'মুসলিম' শব্দটা এড়াবার জন্যই লিখেছেন 'তথাকথিত পাঠান' শব্দদ্বয়। পরবর্তী অংশে আবার 'পাঠান আমলে'র অনিচ্ছাকৃত উল্লেখের পর মোগল আমলের উল্লেখ না করে লিখেছেন 'আকবরের আমলে'। এদিকে আসল কথার কাছেও তিনি এলেন না। বললেন না শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজাদের সময় যা ঘটেনি, তা ঘটল যে মুসলিম শাসকের আমলে—তিনি কে বা তাঁর কি নাম, সেই নামটিও তিনি এড়িয়ে গেছেন। একি ইতিহাস বর্জন নয়? [১৭] বাংলাদেশে পাঠান যুগ এক হিসেবে বাংলা বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতার যে শ্রী ফুটে উঠেছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তা জগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হলো। এই স্বাধীনতার ফলে বাংলার

---

[১৬] ড. এস. এম. লুৎফর, 'মুসলমানরাই ভাস্কর আদি ওয়ালেদ', *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, সম্পা. শেখ তোফাজ্জল হোসেন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১১৯

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২২

প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পেয়েছিল, এ দেশের ইতিহাসে অন্য কোনো সময়ে এমন দ্রুত বিকাশ সচরাচর দেখা যায় না।[১৮]

০৩

পৃথিবীর এক কোণে অবস্থিত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, এটা সত্যিই বিস্ময়কর। তাই বলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠার পেছনে যা-তা একটা কারণ বলে দিলেই তা যথার্থ হবে, এমন নয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলার ইতিহাস বিশেষ করে মুসলিম শাসনামল সম্পর্কে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কমই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলার পি. কে. হিট্টি হিসেবে খ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম যা আলোকপাত করেছেন, তৎসম্বন্ধীয় পরবর্তী রচনাগুলো তারই চর্বিতচর্বণ। দু-একটা শব্দ এদিক-সেদিক করে 'বিদগ্ধ' লেখকগণ তা নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি বাংলায় মুসলিম শাসনামল নিয়ে রচিত অসংখ্য অপ-ইতিহাসের আংশিক জবাব।

আমরা এখানে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিনি, শুধু বাংলায় ইসলামের প্রসার ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। লেখাটিও বেশ অনেক দিন আগের। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে ধন্যবাদ জানাই। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ। মহান আল্লাহ সবাইকে সুস্বাস্থ্য ও হায়াতে তাইয়েবা দান করুন, আমিন!

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

[১৮] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

বাংলার পরিচিতি : জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক অবস্থান

বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনামলে উত্তর বাংলা প্রথমে পুণ্ড্র, পরে বরেন্দ্র; পশ্চিমবঙ্গ প্রথমে সুম্ম, পরে রাঢ়; পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল বঙ্গ এবং মেঘনা তীরবর্তী এলাকা সমতট হিসেবে পরিচিত হলেও মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিত হয়।[১৯] 'বঙ্গ' ছিল একটি অতি প্রাচীন জনপদ। ঋগবেদ বঙ্গের কোনো উল্লেখ না থাকলেও *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০] বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত ১৬টি জনপদের অন্যতম জনপদ হচ্ছে 'বঙ্গ'।[২১] রামায়ণ ও মহাভারতেও 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে, তবে এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায়, এটা ছিল ভগীরথীর পূর্বাঞ্চল।[২২] মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে মুসলিম শাসক ও ঐতিহাসিকরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বঙ্গ ও বাঙ্গালা বলে অভিহিত করত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, রাঢ়, বাঙ্গালা প্রভৃতি অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করেন এবং নিজে শাহ-ই-বাঙ্গালা বা সুলতান-ই-বাঙ্গাল উপাধি ধারণ করেন। এ সময় থেকে সমগ্র বাংলাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে। এর পূর্বে শুধু বাঙ্গালার (পূর্ব বাংলার) অধিবাসীকে বাঙ্গালা বা বাঙালি বলা হতো। তবে ইলিয়াস শাহের সময় থেকে রাঢ় ও লখনৌতির লোকেরাও বাঙালি নামে অভিহিত হয়।[২৩]

ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর বর্ণনার কয়েক স্থানে বঙ্গ-এর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—'বখতিয়ার খলজি লখনৌতি, বিহার, বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন।'[২৪] মিনহাজ আরও বলেন—'সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজিকে (১২১২-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) জাজনপুর, বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত রাজ্যসমূহ কর প্রদান করত।'[২৫] মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র এলাকা ছিল না; বরং তা ছিল একটি রাজ। সুতরাং পশ্চিমে ভগীরথী ও করতোয়া নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড

---

[১৯] ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৯; ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭), পৃ. ১

[২০] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন; ১৯৯৯), পৃ. ১৬

[২১] ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২৪] মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরি*, আ.শ.ম. যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২১

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

নিয়ে প্রাচীন বঙ্গ রাজ ছিল। সপ্তদশ শতকে লিখিত তথ্যানুযায়ী বঙ্গ-এর সীমা ছিল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত। সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায়, ঢাকা-ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জ বঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনায় বোঝা যায়, রাঢ় ও বরেন্দ্রের পূর্বে বঙ্গ অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল মোগল আমলের সুবা বাঙ্গালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সুবা বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, সুবা বাঙ্গালা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার অবস্থিত ছিল। মোগল হতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত পশ্চিমে তেলিয়াগড় থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাংলার সীমানা।

'বঙ্গ' থেকেই 'বাঙ্গালা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, বঙ্গ-ই বঙ্গালাহ নামে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গালাহ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনিতে। মূলত শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে বঙ্গালাহ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মোগল এবং মোগল যুগের আফগান ঐতিহাসিকগণ সকলে বঙ্গালাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। টোডরমলের ভূমি বন্দোবস্তে সুবা বঙ্গালার বিবরণ আছে। আবুল ফজল শুধু যে সুবা বাংলার উল্লেখ করেছেন তা-ই নয়, তিনি সুবা বাংলার সীমাও বর্ণনা করেছেন—যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী* এবং গোলাম হোসেন সলীমের *রিয়াজ-উস-সালাতিনে* সুবা বাংলার আয়তন যা দেওয়া হয়েছে, তা আবুল ফজলের বর্ণনার সাথে মিলে যায়।

ইউরোপীয়রা প্রথম দিকে বাংলাকে Bengala বা Bengal বললেও মোগল সুবা বাঙ্গালা ইংরেজদের অধিকারে যাওয়ার পরে Bengal নামেই পরিচিত হয়। Bengal বা Bengala হলো বাঙ্গালা'রই ইউরোপীয় বা ইংরেজি রূপ। বাংলার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা; পূর্বে লুসাই, খাসিয়া ও জয়ান্তিকা পর্বতমালা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন এবং পশ্চিম সীমান্ত জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল। এ কারণে বাংলাদেশে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা ছিল খুব কম। বাংলাদেশের উত্তরে পর্বতমালা এবং আরও উত্তরে পার্বত্য দেশ তিব্বত। তিব্বত ও বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে তিব্বতের অধিবাসীরা ঘোড়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর বাংলার বাজারে যাওয়া-আসা করত। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা বেষ্টিত কোচ, কামতা ও কামরূপ রাজ্য ছিল। কামরূপ ও কামতার সাথে বাংলার মুসলিম সুলতানদের সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। পূর্ব সীমান্তে ছিল ত্রিপুরা রাজ। গোমতী নদী উভয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় এ পথ দিয়ে বহিরাক্রমণের তেমন কোনো আশঙ্কা ছিল না। কেননা, সমুদ্রপথে যুদ্ধ করার মতো ভারত উপমহাদেশের কোনো অঞ্চলেরই নৌবাহিনী ছিল না। তবে ইউরোপীয়দের আগমনের পর সমুদ্রপথে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়।

বর্তমানে রাজমহলের উত্তর-পশ্চিম এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সংকীর্ণ তেলিয়াগড় পথের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া ত্রিহুত, সাঁওতাল পরগনা ও সিংহভূমের দিক দিয়েও ভারতের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল। ত্রিহুতের মধ্য দিয়ে

বাংলাদেশে প্রবেশ করা যেত বলে এর নাম ছিল দ্বার-ই-বঙ্গ বা বাংলার দরজা। বেশ কয়েকটি খরস্রোতা নদী থাকায় এ পথটি ছিল দুর্গম। সাঁওতাল পরগনা ও সিংহভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পথটি ঝাড়খন্দ নামে পরিচিত ছিল। এ পথটি তেমন ব্যবহৃত হতো না। সীমান্ত পথে এসব প্রাকৃতিক বাধার কারণে বাংলাদেশে প্রবেশ করা ছিল কঠিন। ফলে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কয়েকটি প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলা একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি এবং পলিমাটির দেশ। এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদনদী। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, করতয়া, মহানন্দা, কুশিয়ারা এবং তাদের শাখা-প্রশাখা যুগ যুগ ধরে বাংলার অধিবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অসংখ্য শহর ও নগরের উত্থান-পতনে এ নদীগুলোর ভূমিকা ছিল। গোড়া থেকেই এগুলো ছিল বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস। বাংলার জমির অসাধারণ উর্বরতা, শস্যের প্রাচুর্য এবং অধিবাসীদের সমৃদ্ধি এ নদনদীগুলোর কারণেই সম্ভব হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা প্রদেশে নদনদীগুলোর ভাঙা-গড়ার ধারা অব্যাহত ছিল।

আবুল ফজলের মতে, গ্রীষ্মকালে বাংলার গরম খুব প্রখর ছিল না এবং শীতকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকত এবং এ সময় বাংলার অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন থাকত। এ সময় বাংলায় যে কালবৈশাখীর তাণ্ডবলিলা, নদনদীর প্লাবন এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত, তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নদনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিত। ফলে মশা, মাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যেত। ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটত। তাই বাংলার প্রতি বহিরাগত পর্যটকদের বিরূপ মনোভাব ছিল। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা বাংলাকে দুর্গম করেছিল এবং এটা বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করত। বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থান এ দেশের শাসনকর্তাদের বিদ্রোহী কিংবা স্বাধীন থাকতে উৎসাহিত করত। আবুল ফজল বলেন, জলবায়ুর সুবিধার কারণে বাংলায় বিরোধের ধূলি সর্বদা উত্থিত হয়েছে। সেজন্য প্রাচীন লেখকদের বর্ণনায় এটা 'বালগাক খানা' বা 'বিদ্রোহের নগরী' নামে অভিহিত হয়েছে।

প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনসাধারণ সাধারণত হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্ত্যজ শ্রেণির অধিবাসী এবং কিছুসংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তবে এর আদিম অধিবাসী ছিল বঙ্গ ও পুণ্ড্র। এরা দ্রাবিড় ও আর্যদের থেকে পৃথক ছিল এবং বর্তমানকালের কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি লোকদের আদিপুরুষ ছিল। পণ্ডিতরা বাংলার অধিবাসীদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক নামে অভিহিত করেছেন। এরা নিষাদ জাতি হিসেবেও পরিচিত। এরপর আরও কয়েক জাতির লোক এখানে আসে। এদের মধ্যে মোঙ্গল, দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক আসে; যদিও তারা মোঙ্গল বা দ্রাবিড় ছিল না।

পরে পামির অঞ্চল থেকে হোমো আলপাইনাস নামে এক জাতীয় লোক আসে। এদের থেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য হিন্দুদের উদ্ভব হয়েছে। এরা বৈদিক আর্য জাতি থেকে পৃথক ছিল। পরবর্তীকালে কিছুসংখ্যক আর্য বাংলায় আসে। বৈদিক যুগের শেষভাগে বাংলায় আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডারের বিজয় পরবর্তী সময় বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে মৌর্যোত্তর বাংলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর

শেষদিকে এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম থেকে গুপ্ত শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উত্তর বাংলায় গুপ্ত শাসন অব্যাহত ছিল। এ সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার ঘটলেও গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার ঘটে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়।

উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ এবং মগধ 'গৌড় জনপদ' নামে সুপরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনো একসময় শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন। সামন্তরূপে জীবন শুরু করলেও ৬০৬ খ্রিষ্ট-পূর্বে শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্কের রাজত্বের পর বাংলার ইতিহাস ছিল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সময় কোনো স্থায়ী শাসন গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেনি। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং ধনিক শ্রেণি নিজ নিজ গৃহে ও আশেপাশের এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। এ অরাজকতার মধ্য থেকেই পাল বংশের গোপাল বাংলার রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনের ওপর ভিত্তি করে তার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অবনতি ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় এক নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়। উত্তর বাংলায় সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহের সময় পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন বিজয় সেন। সেন রাজবংশের আদিপুরুষের নাম সামন্ত সেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সামন্ত সেনই সেন বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কি না, তাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হেমন্ত সেনের পর তার পুত্র বিজয় সেন ক্ষমতা দখল করেন। তিনিই ছিলেন এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বিজয় সেন পশ্চিম ও উত্তর বাংলা থেকে পাল শাসন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রায় সমগ্র বাংলায় স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলায় একক স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় সেনদের শাসনাধীনে। বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন বল্লাল সেন। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই লক্ষণ সেনের শাসনামলেই বাংলায় বখতিয়ার খলজির আগমন ঘটেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি[২৬] সম্ভবত ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে[২৭] নদীয়া আক্রমণ করেন। নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মনাবতী (গৌড়) দখল

---

[২৬] মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির প্রকৃত নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ *তবকাত-ই-নাসিরি*–তে নামটি উল্লেখ করেছেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজিরূপে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুসলিম বাংলার বিজেতার নাম ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে, বখতিয়ার খলজির ছেলে ইখতিয়ার উদ্দিন বাংলা বিজয় করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বঙ্গ বিজেতার নাম ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি বা সংক্ষেপে বখতিয়ার খলজি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ার খলজির রাজ পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বখতিয়ার খলজি রাজশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তবে তিনি সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর লখনৌর মুকতা[২৮] মুহাম্মাদ শিরান খলজি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২০৭-১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিরান খলজির পর হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি দিল্লির অধীনস্থ শাসক হিসেবে ১২০৮ থেকে ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির আরেক সহচর আলি মর্দান খলজি কুতুব উদ্দিনের গভর্নর হয়ে লখনৌতিতে এলে হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি আলি মর্দানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

এ বছরই কুতুব উদ্দিনের মৃত্যু হলে লখনৌতিতে আলি মর্দান খলজি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারণ করেন। আলি মর্দান খলজির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে খলজি আমিরেরা একতাবদ্ধ হন এবং গোপনে আলি মর্দান খলজিকে হত্যা করে হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজিকে নেতা নির্বাচিত করেন। হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি "সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি" উপাধি

---

[২৭] সামসময়িক ইতিহাস গ্রন্থ *তবকাত-ই-নাসিরি*তে নদীয়া আক্রমণের কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে নদীয়া আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট ও এডওয়ার্ড টমাস নদীয়া আক্রমণের সন ১২০৩-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ এবং হেনরি ব-খম্যান ১১৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ বলে মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিক মনমোহন চক্রবর্তী, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ও কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ ঐতিহাসিক বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ ১১৯৯-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম মন্তব্য করেছেন, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে শীত মৌসুমে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দকেই নদীয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

[২৮] মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি তার অধিকৃত অঞ্চলকে কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলো ইকতা নামে পরিচিত ছিল। ইকতার শাসককে বলা হতো মুকতা। বখতিয়ার খলজির সময়ের তিনজন মুকাতার নাম পাওয়া যায়; আলি মর্দান খলজি, মুহাম্মাদ শিরান খলজি ও হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজি।